



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 658 - 665

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকে জাতিতত্ত্বের আলোচনায় বাঙালি মুসলমান সমাজ

আলাউদ্দিন শেখ

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান

Email ID: alauddin.hist.10@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Ashraf–Atraf, 1872
Census, Conversion
theory, Migration/
descent theory,
James Wise,
Herbert Risley,
Syncretism,
Occupation-based
caste, Syed–Sheikh–
Pathan–Mughal,
Subaltern/ low-caste
communities.

Abstract

In the 19th century, British colonial administration began systematic ethnographic study of India through Buchanan-Hamilton, later developed by Dalton, Sherring, and brought to full form by James Wise, William Hunter, and Herbert Risley. Census operations became a key tool for this ‘caste’ and ethnic classification project, and Bengali Muslims became a central subject of this inquiry.

The first census of 1830 (Dhaka) and later the 1872 Bengal census revealed something the British did not expect: districts like Chittagong, Noakhali, Pabna, and Rajshahi had Muslim populations of 70% or more. This unsettled colonial officials, since prior assumptions held that Hindus were the majority in Bengal. Two competing explanations emerged -

1. Conversion theory: Officials like Beverley and Risley argued that large numbers of low-caste Hindus (Chandals, Rajbanshis) and Buddhists converted to Islam to escape the oppression of Hindu caste hierarchy.

2. Migration/ descent theory: James Wise and elite Bengali Muslims (such as Khondkar Fazle Rabbi) rejected this, arguing that Bengali Muslims were largely descendants of migrants from Arabia, Persia, Central Asia, and northern India.

The essay describes two social strata within Bengali Muslim society - **Ashraf** — claiming foreign descent, using titles like Syed, Sheikh, Mughal, Pathan, holding higher social status.

Atraf — of local origin, organized by occupation (weavers/ Jolha, fishmongers/ Nikari, oil-pressers/ Kalu, barbers/ Hajam, etc.), occupying lower social rank.

Ashraf groups maintained social distance from Atraf communities, and certain occupations (like weaving) were considered degrading for an Ashraf to take up. Occupational hierarchy also existed within the Atraf group itself—

tailors and bookbinders were considered more respectable than fishermen or indigo workers.

The essay outlines several factors behind Islam's spread in Bengal - political patronage from Muslim rulers, construction of mosques and madrasas, missionary work by Sufi saints, intermarriage between Muslim migrants and local women, and the appeal of escaping caste-based discrimination. Scholars like Richard Eaton, Asim Roy, Sonia Nishat Amin, and Rafiuddin Ahmed are cited to show that Bengali Islam developed a distinct syncretic character — a blend of external Islamic ideology and local Bengali culture, which Momtazur Rahman Tarafdar called a 'regional form of Islam'.

Muhammad Mohar Ali's estimate that conversion accounted for over 15% of the local population across five hundred years supports the view that both migration and conversion processes operated together — no single theory fully explains the demographic and cultural formation of Bengali Muslim society.

Discussion

উনিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা ও বিহারের জাতিতত্ত্ব বিষয়ে বুকানন-হ্যামিলটনের মধ্য দিয়ে যে সরকারি চর্চা শুরু হয়, তা প্রাথমিক পর্যায়ে ডাল্টন ও শেরিং-এর লেখায় আমরা দেখতে পাই। পরবর্তীকালে জনগণনার মধ্যে দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। এর সম্পূর্ণ রূপ উনিশ শতকের শেষে জেমস ওয়াইজ, উইলিয়াম হান্টার এবং হার্বার্ট রিজলের মাধ্যমে পরিণত হয়। বিংশ শতকের প্রথমদিকে ও'ম্যাল, হাটন ও ব্লান্টের আলোচনায় তা সমাপ্ত হয়। এই সমস্ত সরকারি অনুসন্ধানের মধ্যে 'জাত' গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অধিকার করেছিল।

১৮৩০ সালে হেনরি ওয়াল্টার সর্বপ্রথম ভারতের ঢাকা শহরের জনগণনা করেন, যার থেকে জানা যায় ৬৬,৬৬৭ জন দেশীয় জনগণের মধ্যে মুসলমান ৩৫,২৩৮ জন এবং হিন্দু ছিল ৩১,৪২৯ জন।^১ ১৮৭২ সালে বাংলা প্রদেশের সরকারি জনগণনায় দেখা যায় চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৭০ শতাংশ বা তার বেশি, বগুড়ায় ৪০ শতাংশ,^২ এই রিপোর্ট ইংরেজ সরকারি কর্মচারীদের রীতিমতো বিচলিত করে। তৎকালীন ইংরেজ আধিকারিক জেমস ওয়াইজ লেখেন, -

“১৮৭২ সালের জনগণনায় এক প্রবল কৌতূহলজনক সত্য উন্মোচিত হয়। এক বৃহৎ অংশ মুসলমান সম্প্রদায় অধ্যুষিত পুরনো রাজধানীর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নয়, দক্ষিণবঙ্গে ব-দ্বীপের পলিমৃত্তিকাবৃত অঞ্চলে বাস করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বপ্রান্তে ইসলাম ধর্মের প্রসারের ইতিহাস বর্তমান দিনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, কেবলমাত্র সতর্কতাই নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।”^৩

১৮৭২ সালের জনগণনায় দেখা যায়, বাংলা প্রদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮% ছিল মুসলমান, যারা বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বাস করত।^৪

বাংলার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানরা মূলত উৎপাদন শিল্প, কৃষি এবং ছোট সেবামূলক পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে অধিকাংশই কৃষিজীবী, যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অবদমিত এবং সামাজিক দিক থেকে উপেক্ষিত। এর জন্য ১৮৭২ সালের প্রথম জনগণনা পর্যন্ত তাদের সংখ্যাগতভাবে গুরুত্ব বোঝার উপায় ছিল না।^৫ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ১৮৮৮ সালে এক বক্তৃতায় বলেন যে, -

“...পূর্ব বাংলায় ব-দ্বীপ অঞ্চলে মুসলমান যুব সমাজ মাঝি ও নাবিক হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিল।”^৬

রাজশাহী, ঢাকা বিভাগের মুসলমান কৃষিজীবীর এক বিশাল সম্প্রদায় তাদের পূর্ব-পুরুষদের মতো চাষাবাস করত। তারা ছিল বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এক হতদরিদ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের জনগণনায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দুই-তৃতীয়াংশ এবং উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিন-পঞ্চমাংশ জনসংখ্যা মুসলমান ছিল।^৭ ইংরেজ কর্মচারী এবং জনগণনা বিভাগের কর্মচারীগণের অনেকেই এই বিষয়ে চর্চা করতে শুরু করেন। বেভারলি লেখেন, -

“হয়ত ব-দ্বীপের এই অংশে মুসলমান ধর্মীয় উপকরণের এবং সংখ্যাধিক্যের প্রকৃত বিশ্লেষণ ছিল। বিপুল পরিমাণ নিম্নবর্ণীয় জাত, বিশেষ করে চণ্ডাল ও রাজবংশীরা এই সকল অঞ্চল অধিকার করার দরুণ তাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল।”^৮

এইচ. রিসলে ১৮৫ জন নিম্নবর্ণীয় মুসলমানের ওপর নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চণ্ডাল ও রাজবংশীরা বাঙালি মুসলমানে পরিণত হয়েছিল।^৯ কিন্তু জেমস ওয়াইজ ‘অভিবাসন তত্ত্ব’কে উপেক্ষা করে মন্তব্য করেন যে, উত্তর ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অভিবাসনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। একথাও সত্য মুঘল বাদশাহ আকবরের শাসনকালে বাংলার জলবায়ু মুঘল অনুপ্রবেশকারীদের কাছে এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, ঐ সকল জায়গায় যাওয়ার নির্দেশকে তারা নির্বাসন হিসেবে বিবেচনা করত।^{১০} অ-খ্রিস্টান বাঙালিরা কেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তার স্বপক্ষে জেমস ওয়াইজ অনেকগুলো যুক্তি দিয়েছেন, যার মূল কথা হল ‘Religion and Sword’ তত্ত্ব। তিনি কোন প্রমাণ ছাড়াই উল্লেখ করেন, -

“ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে উদ্দীপিত সেনারা বাংলার ভীষণ জাতির মধ্যে ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস তরবারির মারফত বলপূর্বক প্রসার করেছিলেন এবং পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ঘন অরণ্যে অনুপ্রবেশ করে সিলেটের গ্রামে গ্রামে ইসলাম ধর্মের প্রতীকচিহ্ন স্থাপন করেছিলেন।”^{১১}

ব্রিটিশ শাসনে মুসলমানরা, যারা সবদিকে হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে ছিল, তারা ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের জন্য সরকারের সন্দেহভাজন তালিকায় আরও খারাপভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। হান্টার বলিষ্ঠভাবে একবিশেষ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সকলের সামনে উন্মোচিত করেন।^{১২} বাঙালি মুসলমান সমাজের দুটি স্তর মুসলমান সংস্কৃতির দুটি সুস্পষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করছিল। একদল বিদেশী এবং অন্যদলের উৎস হল দেশীয়। প্রথমদল আশরফ-এর নাম ও রীতিতে আরব, পারস্য এবং উত্তর ভারতের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। অন্যদল আতরাফ-এর ঝোঁক ছিল স্থানীয় নাম ও উপাধি বজায় রাখার। নৃতত্ত্ববিদ এম. এ. ওয়ালি বলেন, -

“ওদের (আশরফ) কাছে ওরা (আতরাফ) হলো মদ বিক্রেতা, তাঁতি ইত্যাদি..., তাদের সব ভণ্ডামি সহ।”^{১৩}

কোন কোন লেখক এই দাবিও তুলেছেন যে আতরাফরা আদৌও মুসলমান নন, কিন্তু রাজনৈতিক বা অন্যান্য কারণে তাদেরকে মুসলমান পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। The Moslem Chronicle - এ এই একই তথ্য পাওয়া যায়, -

“... নদিয়া জেলার পঞ্চাশ শতাংশের বেশি অধিবাসী মুসলমান কিন্তু তাদের আচরণ এবং রীতিনীতি হিন্দুদের মতো; তারা ‘পূজা পার্বন’ উদ্‌যাপন করে।”^{১৪}

১৯০১ সালে জনগণনা অনুসারে বাংলার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ যাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। এই চারটি বিভাগের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলমানরা, মোট জনসংখ্যার ৫১ শতাংশ। ১৯১১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা কমে ৪৫ শতাংশ দাঁড়ায় তখন এটি বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ অবধি ভাবা হত বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রফিউদ্দিন আহমদের মতে, ১৮৭২ সালের জনগণনা প্রথমবার প্রমাণ করে যে মুসলমানরা বাংলার জনসংখ্যার অর্ধেকাংশ। তিনি এই উপস্থিতিতে বাংলার এক ‘অপ্রত্যাশিতভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা’ এবং ‘এক আবিষ্কার’ নাম দেন।^{১৫} ১৮৭২ সালের জনগণনা বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের মূলগত এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় এক বিতর্কের সূচনা করেছিল। যার ফলে দুই গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং ইংরেজ সরকারি কর্মচারী যেমন এইচ. বেভারলি, জেমস ওয়াইজ, ডব্লিউ. হান্টার, বুকানন-হ্যামিলটন এবং হার্বার্ট রিসলে প্রমুখরা বলেন, নিচু জাতের হিন্দুদের বড় অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কিন্তু বাংলার অভিজাত মুসলমানরা তাঁদের মূল উৎস সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। খোন্দকার ফজলে রাব্বি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশ অভিজাত মুসলমান পরিবারের বা অমাত্যদের বংশধর, যাঁরা তাদের মূল উৎপত্তি স্থল থেকে দেশান্তরী হয়ে বাংলায় আসেন।^{১৬} আঢ্য এবং আজাদ লক্ষ্য করেন যে, -

“ইসলামধর্ম বাংলায় এক ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে আসে এবং এর ফলে স্থানীয় জনগণের প্রায় অর্ধেক মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।”^{১৭}

‘শরীফ’-এর অর্থ প্রখ্যাত বা উন্নত-র বহুবচন ‘আশরফ’। রিচার্ড এম. ইটনের মতে, -

“আশরফ-এর প্রতিষ্ঠা ছিল আরব, মধ্য এশিয়া বা আফগানিস্থানভিত্তিক। যার শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক গঠন নয় বরং তাতে গভীর ঐতিহাসিক মূল প্রোথিত হয়ে রয়েছে।”^{১৮}

একথা সত্য যে বাঙালি আশরফ মুসলমানরা তাদের সাংস্কৃতিক বৈষম্য সংরক্ষণ করতে, নিজেদের ঐতিহ্যকে খুঁজে পেতে পশ্চিমের দিকে ও নিজেদেরকে অনুপ্রবেশকারী মনে করেন এবং হজরত মহম্মদের খুব কাছের মানুষদের উত্তরাধিকারী মনে করেন।^{১৯} অসীম রায়ের মতে, -

“বাংলার উঁচুতলার মুসলমানরা বৈবাহিক ক্ষমতার ভিত্তিতে ইতিহাসের সংমিশ্রণ এবং অনুষ্ঠান সুগ্রথিত করার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট সামাজিক পরিচয়ের সংগঠন গড়ে তোলে।”^{২০}

সোনিয়া নিশাত আমিনের মতে, ‘আশরফের সংস্কৃতি হল ‘পারস্য-আরবী’ এবং আতরাফের সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে গ্রামীণ সমন্বয়পন্থী।’^{২১} অসীম রায় মূল সমন্বয়পন্থী প্রতিনিধিদের বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যযুগকারী বলেছেন। এই প্রসঙ্গে অসীম রায় টয়েনবি-র ‘সাংস্কৃতিক দালাল’-র তত্ত্ব ধার করেছেন।^{২২} উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সার্ভে ‘আশরফ’-র ধারণাকে জনসাধারণের বিতর্কে পর্যবসিত করে এবং সামাজিক পরিচয়ের এক নতুন তত্ত্বকে উদ্দীপিত করে। বিশেষ করে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, শেখ, মুঘল ও পাঠান হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এক দাবি জোরদার হয়ে ওঠে। এক জনগণনা থেকে অন্য জনগণনায় তাদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আশরফ গঠিত হয়েছে দেশান্তরী এবং ধর্মান্তরিত দেশীয় অধিবাসীদের দ্বারা। যাঁরা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, পারস্য, আরব এবং উত্তর ভারত থেকে এসেছেন। তাঁরা দাবি করেন যে, ইসলাম ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ বা তাঁর উপজাতি ‘কুরাইশ’-র সরাসরি উত্তরসূরী।^{২৩} ধর্মান্তরীকরণে ব্রাহ্মণের জন্য ‘সৈয়দ’ পদ আর কায়স্থের জন্য ‘শেখ’-এর পদ বরাদ্দ থাকত। জেমস ওয়াইজের মতে, ‘বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের যে জাত কাঠামো ছিল সেই ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ করত। এমনকি ছেলে তাঁর বাবার ব্যবসা বা পেশা গ্রহণ করত। এই প্রথাকে কখনই অন্ধভাবে অনুসরণযোগ্য নিয়মে পরিণত করেনি।’^{২৪} আশরফ নিজেদের ‘জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব’ সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং সাধারণ জনগণের থেকে নিজেদের আলাদাভাবে বিবেচনা করত।^{২৫} আশরফদের কাছে বেশ কিছু পেশা গ্রহণ নিন্দনীয় ছিল, যেমন কোনো শরিফ কখনই তাঁতি (জোলা) হবে না। আর যদি সে পেশায় প্রবেশ করে তবে তাঁর সামাজিক অবনতি হিসেবে ধরা হত।^{২৬} সামাজিক পদমর্যাদায় সৈয়দরা ছিল উচ্চতম (২৭.৪%)। নূন্যতম শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা নিম্নতর পেশাগত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। যেমন, নিকারি (মাছ বিক্রেতা), কলু (তেল তৈরি করতো), লহরি (কঙ্কাল বিক্রেতা), মুচি (জুতো সারাই করত), বেহারা (পাঙ্কি বাহক), ভাট (কুলুজবিদ), হাজাম (নাপিত), জোলা (তাঁতি) ইত্যাদি।^{২৭}

আশরফ ছাড়া বাকি মুসলমানরা মূলত দুভাগে বিভক্ত - কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পী। জেমস ওয়াইজ তাঁর গবেষণায় ঢাকা জেলা থেকে প্রাথমিকভাবে ছিয়াশিটি মুসলমান উপজীবী সম্প্রদায়ের তালিকা তৈরি করেন।^{২৮} রফিউদ্দিন আহমদের মতে, নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জাত পৃথক করার মূল মাপকাঠি হল পেশা।^{২৯} সোনিয়া নিশাত আমিনের মতে, এর ফলে অনেক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব ঘটে, যারা কেউই উঁচুদরের মুঘল কর্মচারী বা জমিদার নন অথবা পুরনো বনেদিয়ানার চৌধুরি, মির্জা, শেখ, তালুকদার, ভুঁইঞাও নন। তারা নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায় যেমন জোলা (তাঁতি), নিকারি (জেলে), নীলগর (নীল শ্রমিক), কলু (তেল ব্যবসায়ী), ধুনিয়া (তুলো ধোনে), হাজাম (নাপিত) ইত্যাদি।^{৩০} জেমস ওয়াইজ মুসলমান সমাজের শ্রেণিবিভাগ করতে এদের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবণতা ছিল পেশার দিক থেকে ‘সম্মানীয়’ ও ‘ঘৃণাজনক’ এবং গোষ্ঠীর মর্যাদা নির্ভর করত কী ধরনের পেশা এই গোষ্ঠীর সদস্যরা অনুসরণ করছে তার ওপর।^{৩১} জেমস ওয়াইজের মতে, সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা ছিল তাদের, যারা ছিল দর্জি (কাপড় সেলাই), জিলভার (বই বাঁধাই), জুতোওয়ালা (জুতো বিক্রেতা), নানবাই (রুটি প্রস্তুতকারক), নাইচব্যাড (নখ প্রস্তুতকারক), পাটয়া (কেশ বন্ধক), রংরেজ (রং করে যে)। অসম্মানজনক পেশা ছিল তাদের, যারা ছিল বাজুনিয়া (বাজনাদার) এবং নীলগর (নীল রং করে যারা)।

কবর-খনক, ধোপা, জেলে ও নীল রং প্রস্তুতকারকদের পেশা এতটাই নিম্ন ভাবা হত যে তাদের সমর্থকদেরও নিন্দা করা হত।^{১২} নীলকর, বাজনাদার, বেহারি, দায়াস, ধুনিয়া ও হাজামদের মুসলমান কৃষিজীবীরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখত।^{১৩} তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে জাত কাঠামোর পেশাগত ভিত্তি অনেকটা তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

পূর্ব বাংলায় মূলত গ্রামীণ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। অনুমান করা হয় যে, আদিম উপজাতিদের থেকে এই ধর্মান্তরীকরণ শুরু হয়। কারণ তাদের আচরণ, রীতিনীতি, শারীরিক আদল এবং জাত-বিভেদ একই রকম ছিল।^{১৪} বাংলাদেশে ইসলামের প্রসারের পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল। শাসকশ্রেণি, অমাত্যগণ ও রাজকর্মচারীরা মুসলমান সমাজের বৃদ্ধি এবং ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও দরগা বানিয়ে ইসলামের প্রচার করেন। এর সঙ্গে মুসলমান পণ্ডিত এবং সাধকদের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্যে উৎসাহ, জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। যার মূল কারণ বিদেশী মুসলমানদের অভিবাসন। অভিবাসী বিদেশী মুসলমানরা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে বাংলায় ভিড় জমিয়েছিলেন, যার ফলে সমাজে অনেক নতুন উপকরণ তৈরি হয়েছিল। তাঁরা হিন্দু রমনীকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের সন্তানদের জন্ম হয়েছিল মিশ্র বিবাহের ফলে।^{১৫} অপর একটি উপাদান হল, নিচু জাতের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়া, যার পিছনে ছিল সামাজিক কারণ। পূর্ব-বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের প্রক্রিয়া শিথিল ছিল। পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ পুরোপুরি হিন্দু ছিল না, মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের সময় অবমূল্যায়িত বৌদ্ধধর্মের অনুগামী। ঐতিহ্য অনুসারে বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের মধ্যে শত্রুতা ছিল। সেন রাজত্বে ব্রাহ্মণদের পুনর্জাগরণের ফলে যে বৌদ্ধরা অত্যাচারিত হয়েছিলেন তারা মনে করতেন মুসলমান বিজয়ীরা তাঁদের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য দেবতারূপে এসেছেন।^{১৬}

যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মর্যাদা ছিল সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। তারা ছিলেন নিম্নশ্রেণির কিন্তু উপজীবিকার দিক থেকে উচ্চস্তরের। নিম্নশ্রেণির জনসাধারণ ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন সামাজিক অবিচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষিত করার জন্য। বেভারলির মতে, -

“অসংখ্য নীচু জাতের মানুষের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পিছনে হিন্দুধর্মের নিজস্ব জাত ব্যবস্থা ছিল প্রধান ও অন্যতম কারণ।”^{১৭}

বেভারলি, রিসলের তত্ত্বকে খণ্ডন করে খোন্দকার ফজলে রাব্বি বলেন যে, অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানরা বিদেশীদের নতুন প্রজন্ম। মুসলমান শাসকরা সবসময় তাদের রাজধানী (গৌড়, রাজমহল ও ঢাকা) এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এসব শহরে প্রচুর মুসলমান জনসংখ্যা এরা আর কেউ নয় যারা একসময় ক্ষমতায় ছিলেন সেই শাসকবর্গের উত্তরসূরী।^{১৮} কিন্তু আর. সি. মজুমদার লিখেছেন, -

“বাংলায় ইসলাম ধর্মের এত প্রসারের পিছনে আছে বলপ্রয়োগ।”^{১৯}

মহম্মদ মোহর আলি বলেন যে, বাংলার মুসলমানরা ছিল ব্যাপকভাবে অভিবাসী এবং কিছুটা স্থানীয় ধর্মান্তরিত। বেশিরভাগ ধর্মান্তরিত হত হিন্দুদের উচ্চতম ও নিম্নতম শ্রেণি থেকে। তার সঙ্গে বৌদ্ধরাও ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এমনকি কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কিছু ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, পাঁচশো বছরে এই ধর্মান্তরীকরণের হার মোট স্থানীয় অধিবাসীর পনেরো শতাংশেরও বেশি।^{২০} অসীম রায় আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, -

“বাঙালি মুসলমানদের সমবেষ্টিত পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ক্ষেত্রবিশিষ্ট ‘ইসলামীয়’ আদর্শ এবং স্থানীয় ভৌগোলিক বাঙালি সংস্কৃতির দুই বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।”^{২১}

বাংলার ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, অসীম রায় যাকে ‘ইসলামীয় সমন্বয়পন্থী ঐতিহ্য’ বলেছেন। তিনি বলেন, -

“বাংলায় মুসলমানকরণ হল এক অনধিকারমূলক ধর্ম এবং একটি দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের ফলাফল যা থেকে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে।”^{২২}

বাংলায় ইসলাম ধর্ম তার মৌলিক ও বহিরাগত পরিচয়ের বাইরে এক অন্য চরিত্র লাভ করে। মমতাজুর রহমান তরফদার ইসলামের এই স্থানীয় চরিত্রকে ‘ইসলাম ধর্মের আঞ্চলিক ধরণ’ নাম দিয়েছেন।^{২৩}

বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষত মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার আদান-প্রদানের ফলে এক নতুন সংস্কৃতি জাগরিত হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জাগরণে প্রথমদিককার মুসলমান শাসক, পণ্ডিত ও জনসাধারণের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একথা সত্য যে, প্রথমদিকের আরব ও পারস্যের বণিকরা বাংলাদেশের অ-মুসলমান বসতিতে ইসলামের বাণী প্রচার করার জন্য সুফি ও অন্যান্য মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের পথ তৈরি করে দেন।^{৪৪} প্রথমদিকের বেশ কিছু মুসলমান ধর্মপ্রচারকের মধ্যে ছিলেন ঢাকা জেলার বাবা আদম শহিদ, ময়মনসিংহের শাহ সুলতান রুমি এবং পাবনার মখদম শাহ দওলাহ। এই সকল ধর্মপ্রচারকেরা শুধু বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাই নয়, এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক ইসলামের প্রবেশ পথও তৈরি করেছিলেন। আর্নল্ড সঠিকভাবেই বলেছেন, -

“দক্ষিণবঙ্গে ইসলাম ধর্ম যে স্থানীয় সাফল্য লাভ করেছিল তা জোরপূর্বক বলা যায় না। মানুষের কাছে আবেদন করা হয়েছিল এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য ব্যাপক জনতাও পাওয়া গিয়েছিল।”^{৪৫}

ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যায় যে, ইসলাম ধর্ম বখতিয়ার খলজির আগমনের বহু পূর্বে বাংলাদেশে শুধু পৌঁছেছিল তাই নয়, মুসলমান শাসনের বহু পূর্বে এটি স্থায়ীভাবে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর জন্য জালাল-আল-দীন তারিজি, শরাফ আলদীন আবু-তায়ানাহ, আলা-আল হক এবং নূর-কুতব-আলম-এর মতো প্রথমদিকের মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের ধর্মপ্রচারের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয়। তাঁরা বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রসারে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

Reference:

১. Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division, E.M. Lewis, Calcutta Central Press Company, Calcutta, 1868, p. 2
২. H. Beverly, Report on the Census of Bengal, 1872, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872, pp. 12-15
৩. James Wise, Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal, Harrison, and Sons, St. Martins Lane, London, 1883, p. 1
৪. H. Beverly, op. Cit., p. 130
৫. Ibid, p. 109
৬. Sir Syed Ahmed, On the Present State of Indian Politics: Consisting of Speeches and Letter, Printed at the Pioneer Press, Allahabad, 1888, p. 36
৭. J. A. Bourdillon, Census of Bengal, 1881, Vol-I, Superintendent of Census Operations, Calcutta, 1883, p. 78
৮. H. Beverly, op. Cit., p. 134
৯. H. H. Risley, Tribes and Castes of Bengal, Anthropometric Data, Vol-I, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1891, pp. 102-114
১০. James Wise, op. Cit., p. 2-3
১১. Ibid, p. 4
১২. উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, আবদুল মওদুদ অনুদিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৭০, পৃ. ৩-১০৩
১৩. Maulavi Abdul Wali, *Ethnographical Notes on the Muhammandan Castes of Bengal*, Subhadra Mitra Channa, Lancy Lobo (Ed.) Religious Pluralism in India Ethnographic and Philosophic Evidences, 1886-1936, Routledge India, London, 2023, p. 101

১৪. Abdul Karim, A Social History of the Muslims of Bengal Down to A. D. 1538, The Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1959, p. 140, 157
১৫. Rafiuddin Ahmad, The Bengal Muslims 1871-1906; A Quest for Identity, Oxford University Press, Delhi, 1981, p. 1
১৬. Khondkar Fuzli Rubbee, The Origin of the Musalmans of Bengal, Thacker, Spink, and Co., Calcutta, 1895, p. 6-65
১৭. Premen Addy and Ibne Azad, Politics and Culture in Bengal, New Left Review, 1/79, May-June-1973
১৮. R. M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, University of California Press, Berkeley, 1993, p. 167-171
১৯. Tapan Raychaudhuri, *Norms of Family Life and Personal Morality among the Bengali Hindu Elite 1600-1850*, Rachel Van M. Baumer (ed.), Aspects of Bengali History and Society, The University Press of Hawaii, USA, 1975, p. 19
২০. Asim Roy, Islam in the Environment of Medieval Bengal, The Australian National University, 1970, p. 33
২১. Sonia Nishat Amin, The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939, Brill Leiden, New Netherlands, 1996, p. 36
২২. Asim Roy, op. Cit., p. 71
২৩. Reuben Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge University Press, 1957, pp. 67-68
২৪. James Wise, op. Cit., p. 64
২৫. Rafiuddin Ahmad, op. Cit., p. 13
২৬. Khondkar Fuzli Rubbee, op. Cit., p. 59
২৭. E. A. Gait, Census of India, 1901, VI., Part-I, The Report, Subsidiary Table V., Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1902, p. 309-10
২৮. James Wise, op. Cit., p. 38-116
২৯. Rafiuddin Ahmad, op. Cit., p. 18
৩০. Sonia Nishat Amin, op. Cit., p. 83-84
৩১. James Wise, op. Cit., p. 34-35
৩২. Ibid, p. 34
৩৩. F. A. Sachse, Bengal District Gazetteers, Mymensingh, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1917, p. 35
৩৪. Murray T. Titus, Islam in India and Pakistan: A Religious History of Islam in India and Pakistan, Y.M.C.A. Publishing House, Calcutta, 1959, p. 44-45
৩৫. আবদুল করিম, বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস, ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃ. ৮৮-১২১
৩৬. জাহিরুল হাসান, বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর, পূর্বা, কলকাতা, মার্চ ২০১৫, পৃ. ২৬-২৭
৩৭. R. C. Mitra, Decline of Buddhism in India, (Visva-Bharati Studies, 20.), Viswa Bharati, 1954, p. 78-81

৩৮. Khondkar Fuzli Rubbee, op. Cit., p. 62-63

৩৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃ. ২৩১-২৩২

৪০. Muhammad Mohar Ali, History of the Muslims of Bengal, Vol-2A, Bengal Muslims During First Century of British Rule, 1757-1871, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Press, Riyadh, 1988, p. 633

৪১. Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Princeton University Press, Princeton, 1983, p. 21

৪২. Asim Roy, op. Cit., p. 24-25

৪৩. Momtazur Rahman Tarafdar, Hasain Shali Bengal, 1494-1538 A. D., A Socio-Political Study, Asiatic Society, Dacca, 1965, p. 93-110

৪৪. Muhammad Mojlum Khan, The Muslim Heritage of Bengal: The Lives, Thoughts and Achievements of Great Muslims Scholars, Writers and Reformers of Bangladesh and West Bengal, Kube Publishing Limited, United Kingdom 2013, p. 13

৪৫. Abdul Karim, op. Cit., p. 40-42